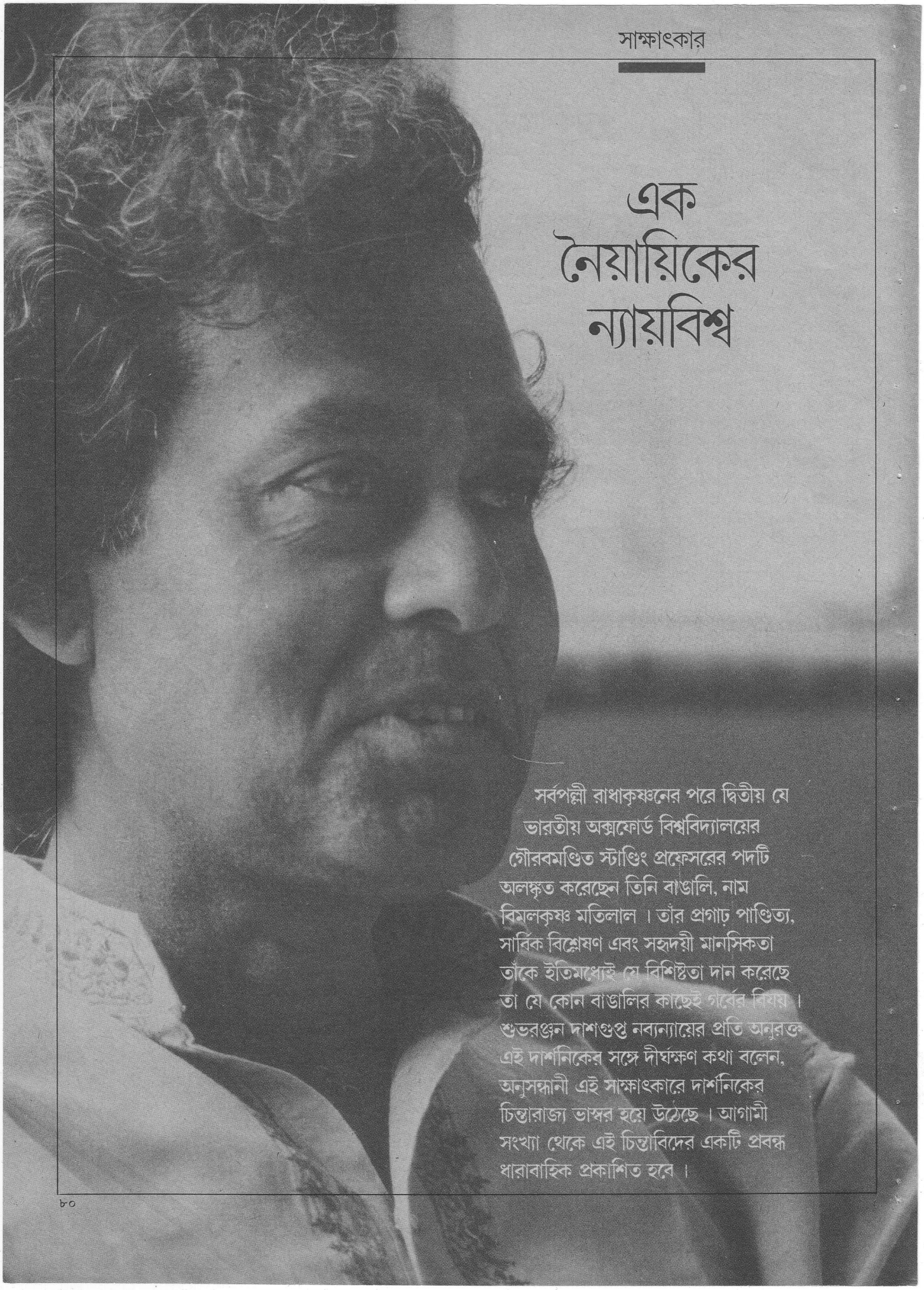

এক নৈয়ায়িকের ন্যায়বিশ্ব

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পরে দ্বিতীয় যে ভারতীয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবমণ্ডিত স্টাণ্ডিং প্রফেসরের পদটি অলঙ্কৃত করেছেন তিনি বাঙালি, নাম বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, সার্বিক বিশ্লেষণ এবং সহৃদয়ী মানসিকতা তাঁকে ইতিমধ্যেই যে বিশিষ্টতা দান করেছে তা যে কোন বাঙালির কাছেই গর্বের বিষয়। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত নব্যন্যায়ের প্রতি অনুরক্ত এই দার্শনিকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন, অনুসন্ধানী এই সাক্ষাৎকারে দার্শনিকের চিন্তারাজ্য ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আগামী সংখ্যা থেকে এই চিন্তাবিদের একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

বিমলকৃষ্ণ মতিলালের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচারে, তাঁরই কক্ষে। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করছিলাম কারণ এর আগে কোন প্রথিতযশা দার্শনিকের সঙ্গে আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি। সংস্কৃতের অধ্যাপক ও দর্শনের ছাত্রী আমার বন্ধু অঞ্জুলিকা মুখোপাধ্যায়ও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। আমরা দুজনেই আশা করেছিলাম যে প্রশ্নের বিশদ উত্তর দিতে তিনি আগ্রহী হবেন, এবং ঠিক তাই হয়েছিল। শুধু উত্তরদানের সময় নয়, চিত্রগ্রহণের মুহূর্তেও তিনি তাঁর ধৈর্য হারাননি।

প্রশ্ন : কয়েকদিন আগেই আপনার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল আপনি দেশে classical studies-এর দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আজকের সংলাপ শুরু করা যাক **ওই** প্রসঙ্গটি দিয়েই। classical studies বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন, শুধুই কি সংস্কৃত ভাষার চর্চা, যা কিছুটা নীরস এবং অনাকর্ষণীয় হতে বাধ্য, না আমাদের বিবিধ বৈভবে পূর্ণ সামগ্রিক ধ্রুপদী সভ্যতার সঙ্গে পুনরায় নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ? পাশ্চাত্যে humanistic learning বলে যা প্রচলিত ও সম্মানিত তারই **নির্যাস** কি আমাদের ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করে আত্মস্থ করতে হবে,?

উত্তর : শুধু সংস্কৃতচর্চা তো নয়ই। classical studies-কে দুটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে, একটি সংস্কৃত-পালি অন্যটি আরবী-ফার্সী, এবং দুটিকেই আমি parallel বা সমান্তরাল মর্যাদা দেব। দুর্ভাগ্যবশত সংস্কৃতচর্চাকেই আমরা ইচ্ছা করে শুষ্ক ও নীরস করে রেখেছি। ধ্রুপদী চর্চা বলতে আমি আবার শুধু অতীতের সাহিত্যপাঠ বোঝাচ্ছি না ; দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সেই সহজ সত্যটি মনে রাখতে হবে যে মানুষ ভুঁইফোড় নয়, তার একটা নির্দিষ্ট অতীত, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট আছে। আমাদের মানস ও চিন্তাধারারও একটা প্রবাহ আছে এবং এসবই তো নেমে এসেছে প্রাচীন যুগ থেকে। এখন তার সঙ্গেই যদি আমাদের কোন যোগ না থাকে আমরা তো আমাদের মাটির তলই খুঁজে পাবো না, শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, বুঝতে পারব না কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং কীভাবে। আর আমরা যদি সচেতনভাবেই এই অজ্ঞাত অবস্থানকে মেনে নিই আমাদের পক্ষে কি চিন্তার ক্ষেত্রে আদৌ কোন সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব ? সম্ভব নয়, কারণ সেক্ষেত্রে এই চিন্তাসৃষ্টির কোন base বা ভিত্তিভূমি থাকবে না। জানেন, পুরোপুরি ধার করা বস্তু নিয়ে বেশী দূর এগোন সম্ভব নয়, বিশেষ কতকগুলি গাছের পরিচর্যা ও বর্ধনের জন্য টব যথেষ্ট নয়, তাদের মাটিতেই রোপণ করতে হবে। অতএব সৃজনমুখী চিন্তার স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। what we are and what we can do for the future, এ দুটি প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাব যদি আমরা এই মাটির যোগকে অস্বীকার না করি। বস্তুত, এই ধারণাটি পাশ্চাত্য থেকে এসেছে এবং একে মূল্য দেওয়া হয় বলেই সেখানে humanistic education-এর কথা নতুনভাবে ভাবা হচ্ছে এবং প্রবর্তনও করা হচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনার এই বিশ্লেষণ উপযুক্ত জার্মান শব্দটি মনে করিয়ে দেয়, geisteswissenschoft বা মনের বিজ্ঞান। এর কোন সংজ্ঞাদান কি সম্ভব ?

উত্তর : সংজ্ঞাদানের ব্যাপারটা বিপত্তিকর, তাই না ? সক্রেটিসকে অনুসরণ করে কতগুলো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নিছক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব বিষয় মনকে সজীবিত করে সে-সবই geisteswissenschoft-এর অন্তর্গত। ধরুন সাহিত্য বা ইতিহাস। উপরন্তু সাহিত্য শুধু কবিতা আর উপন্যাসের সমাবেশ নয়, ইতিহাসও শুধু তথ্য ও অতীতের সমষ্টি নয়। সাহিত্যের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে আবার ইতিহাসও রচনা করা হয় কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করে, যাকে আমরা Philosophy of history বলতে পারি। এ-সব কিছুই যথার্থ humanistic education -এর স্তম্ভস্বরূপ।

প্রশ্ন : আপনাকে স্পষ্ট করে বলছি, যে মুহূর্তে আপনি ঐতিহ্যের কথা বলবেন, অনেকেই হয়ত আপনাকে অতীতসর্বস্ব, অনাধুনিক বলে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করবে। বলবে আপনি বেদে প্রত্যাবর্তনের প্রবক্তা, এবং Hindu view of life-এর বিপজ্জনক সমর্থনে কথা বলছেন। এ ধরনের অভিযোগকে আপনি খণ্ডন করবেন কি করে ?

উত্তর : এই সমস্যাটি দীর্ঘ দিনের এবং পরিচিত। যখনই ধ্রুপদী চর্চার পক্ষে কেউ কথা বলেন তখনই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সম্বোধন করা হয়, অভিযোগ ওঠে যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা স্বচ্ছ চিন্তা করতে আগ্রহী তাঁরা কখনই সেভাবে পিছনে ফিরে যেতে চাইবেন না। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে এই অভিযোগ উত্থাপনের পিছনে কারণও রয়েছে ; আমাদের দেশে বহুবার যা ঘটেছে তা হল প্রাচীন ভারতের মহিমাগান করতে গিয়ে অধিকাংশ গীতিকারই বড্ড বেশী spirituality-র উপর জোর দিয়েছেন, উপনিষদের আলো ইত্যাদি ভাসা ভাসা শব্দ ব্যবহার করে একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এমনকি একসময়ে আমাদের অনেক আন্দোলনও অনুরূপ আবেগের কাছে সমর্পণ করে খানিকটা regressive বা প্রত্যাবর্তী হয়ে উঠেছিল। এগুলির সূচনা হয়েছিল কিন্তু সার্থক ভঙ্গীতে, প্রচলিত নিয়মরীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যদিও পরে চলতি প্রচলনের বিরোধিতা করতে গিয়ে নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে অতীতেই মুক্তি, বেদেই পরিত্রাণ।

আমি কখনও বলিনি এবং বলব না যে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে, এই অতীতেই তো অনেক অন্যায় অবিচার ছিল যা অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চায় **না**। সত্যি বলতে, অতীতের বহু অনাচার থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি, বহু দূর এগিয়েছি, এবং এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেই হবে। কিন্তু অন্য দিকে এগিয়ে যাবার দুর্মর তাগিদেই যদি আমরা অতীতকে পুরোপুরি বর্জন করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি, তাহলে তো ইংরেজিতে বলতে গেলে we shall throw away the baby with the bathwater. অতীতের সম্পদকে অক্ষত রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে বলতে হবে প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। (যদিও অনেক ধর্মপ্রচারকেরা এখনও এ প্রস্তাব দিয়ে থাকেন) খুব খোলাখুলি বললে পূর্ণ প্রত্যাবর্তনের দাবী করার অর্থই হল অহেতুক ধূম্রজালের সৃষ্টি করা, মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া।

নাগার্জুনের চিন্তা ও দর্শনকে এবং তার সঙ্গে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে দেশে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আগ্রহ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে অধিকাংশই বেদ বেদান্ত নিয়ে বেশি শোরগোল তুলতেন, এখনও তোলেন। পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনকে পরিহার করার পিছনে যে কারণ বা অভিসন্ধি দেখানো হত তা হল এই দর্শন বেদবিরোধী। কিন্তু এর উজ্জ্বল বিরাট অবদান, বিশেষ করে মননের ক্ষেত্রে, আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে যাঁরাই সংস্কৃতচর্চার কথা বলেন তাঁদেরই এই প্রচারকদের সঙ্গে একাত্ম করা হয়। আমি চাই দুটিকে স্পষ্টত স্বতন্ত্র করতে, কেন না humanistic education ও তার অঙ্গ অতীতের অধ্যয়ন এবং পুরাতনে প্রত্যাবর্তনের দাবী দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবণতা। Study of classical literature and philosophy must be seperated from this tendency এবং যখন এই বিযুক্তি পূর্ণ হবে তখনই আমরা অতীতের যথার্থ অবদান সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।

প্রশ্ন : আপনি দৃঢ় হস্তে বিভেদরেখাটি অঙ্কন করেছেন, এর প্রয়োজন ছিল। আপনি কি কোন পাঠক্রমের সন্ধান দিতে পারেন যা অতীতবীক্ষার উপর আশ্রয় করেই যুক্তিপ্রিয় ন্যায়বোধকে জাগ্রত করবে ?

উত্তর : যেহেতু আমার বিষয় দর্শন সেহেতু প্রথমেই দর্শনের উল্লেখ করব—নাগার্জুনের চিন্তা ও দর্শনকে এবং তার সঙ্গে সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে দেশে বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি আগ্রহ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে অধিকাংশই বেদ বেদান্ত নিয়ে বেশী শোরগোল তুলতেন, এখনও তোলেন। পূর্বে বৌদ্ধ দর্শনকে পরিহার করার পিছনে যে কারণ বা অভিসন্ধি দেখানো হত তা হল এই দর্শন বেদবিরোধী। কিন্তু এর উজ্জ্বল বিরাট অবদান বিশেষ করে মননের ক্ষেত্রে, আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না। ভারতে যে মননের প্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল তার পিছনে এই দুটি ভিন্ন দর্শনের ভিতর আলোচনা, বিতর্ক এমনকি ঘাত প্রতিঘাতের ভূমিকাই মুখ্য, dialectics-এর সাহায্যেও এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। উত্তর প্রত্যুত্তর, উদাহরণ প্রত্যুদাহরণ মন ও চিন্তাকে সচল রাখে, তখন রেখেছিল এবং এখনও রাখবে।

দেখুন, পাঠক্রমের কথা বলতে গিয়ে অন্য প্রান্তে চলে এসেছি। ফিরে আসা যাক। হ্যাঁ, নাগার্জুন অপরিহার্য, তারপর ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে উদয়নাচার্য।

প্রশ্ন : শংকর ?

উত্তর : হ্যাঁ, শঙ্কর নিশ্চয়ই পড়তে হবে তবে অন্তরায় হল শঙ্করাচার্যের মূল রচনা পড়ার পরিবর্তে ইদানীং তার উপরে লেখা আলোচনাই বেশী জনপ্রিয়। অর্থাৎ মূল গ্রন্থালোচনা সেরকম আর বিশেষ হচ্ছে না। পাঠক্রম থেকে আমি শঙ্করকে বাদ দেব না, রাখব, উপযুক্ত প্রেক্ষিতে। এরপর সাহিত্যতত্ত্ব, অভিনবগুপ্ত, আনন্দবর্ধন প্রমুখ। ভুললে চলবে না যে ভারতের পূর্বে সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং সৃজন প্রক্রিয়ার উপর যা কাজ হয়েছে তা সত্যি বিস্ময়কর। যাঁরা দাবী করেন যে সাহিত্যতত্ত্ব মূলত পরিবর্তনশীল এবং যুগ অনুসারে তা পাল্টায়, তাঁরা এদের রচনা পাঠ করলেই তাঁদের ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবেন। তদুপরি, রাজনৈতিক দর্শনের প্রকৃতি বুঝবার জন্য আমাদের কৌটিল্য পড়া উচিত। রাজনীতির ভিত্তি কী এবং কী হতে পারে সেটুকু জানবার জন্যই কৌটিল্য অবশ্যপাঠ্য। ভর্তৃহরি এবং **পাণিনি,** অর্থাৎ ব্যাকরণ আর ভাষাতত্ত্ব পড়তে হবে। আসলে কি জানেন, প্রাচীন ভারতের কথা উঠলেই সেই রামায়ণ-মহাভারত, সেই পুষ্পক রথ, অতএব আমাদের এরোপ্লেন ছিল, এই অক্লান্ত চর্বিতচর্বণ অতীতের প্রকৃত **ঐশ্বর্যকেই** আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আমাদের প্রকৃত অবদান আমরা ভুলতে বসেছি।

আমাদের এই চরম স্বার্থসিদ্ধির জগতেও নীতিবোধ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। তরুণ-তরুণীরা শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে, প্রকৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধরত, একজন পপস্টার গাইছে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য। কেন, এসব তো এঁরা না করলেও পারেন ? এ ধরনের অনেক উদাহরণই প্রমাণ করে যে এই বস্তু-অধ্যুষিত স্বার্থোন্মাদ জগতেও 'এথিক্স' মনে শুকিয়ে যায়নি, হৃদয় শুকিয়ে যায়নি। কল্যাণবোধ ও নীতির এই অবশিষ্টকেই রবীন্দ্রনাথ 'সারপ্লাস অব ম্যান' বলেছেন।

প্রশ্ন : দর্শনচিন্তার অন্যতম পীঠস্থান, বৌদ্ধিক বিকাশের লীলাভূমি ভারতে দর্শনচিন্তার এই অপমৃত্যু ঘটল কেন ? এর পিছনে সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণ কি ? নব্যন্যায়ের সুদীর্ঘ গরিমাও এত দ্রুত মিলিয়ে গেল কেন ?

উত্তর : প্রথমেই একটা সাধারণ কারণের উল্লেখ করব—something dies out of its own age. একটি ধারা তারা চরমতম স্তরে পৌঁছনোর পর ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয়ে যায়, আমাদের সভ্যতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। দ্বিতীয়, যে কোন কারণেই হোক আমাদের প্রতিপক্ষ বিনষ্ট হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ বলতে আমি স্পষ্ট করে বোঝাচ্ছি non-Hindu Buddhist trend of thought যার জোরালো উপস্থিতি এবং যার সঙ্গে তর্কবিবাদের ফলেই আমাদের দর্শনের সামগ্রিক প্রবাহটি অক্ষত ও সজীব ছিল। মুসলমানদের আক্রমণের পর থেকেই এই অতি প্রয়োজনীয় প্রতিবাদী প্রবাহটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ভিতর একটি মূল পার্থক্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম মন্দিরের উপর নির্ভরশীল হলেও individualistic বা ব্যক্তিনির্ভর, মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি গেলেও হিন্দুত্বের কোন ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে, বৌদ্ধধর্ম মূলত সঙ্ঘভিত্তিক। এক একটি নির্দিষ্ট স্থানে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমণেরা বাস করতেন। আক্রমণের মুখে হিন্দুরা আত্মগোপন করেছিল বা নিভৃতে তাদের ধর্মকে জীইয়ে রেখেছিল কিন্তু সঙ্ঘাশ্রয়ী বৌদ্ধেরা পরিণত হয়েছিল সহজ লক্ষ্যবস্তুতে। তাদের মঠ ধ্বংস করা হয়েছিল, গ্রন্থাদি ভস্মীভূত করা হয়েছিল। তা এই প্রবল আক্রমণের পর বৌদ্ধরা আর নিজেদের পুনঃসংগঠিত করতে পারেনি, তাদের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মননেরও বিলুপ্তি ঘটে। শুধু মুসলমান কেন, এই বৌদ্ধ নিধনে হিন্দুরাও অবদান রাখতে ভোলেনি, এই দুই গোষ্ঠীর ভিতর বিবাদ তো আর মিটে যায়নি। নব্যন্যায়ের বিলুপ্তির পিছনেও এই একই কারণ কাজ করেছে। একান্তভাবে যুক্তিতর্কের উপর নির্ভরশীল এই দর্শন বৌদ্ধদের বিলোপের পর আর প্রতিপক্ষ খুঁজে পেল না। কিছুদিন নিজেদের মধ্যেই প্রতিপক্ষ খাড়া করে সূক্ষ্ম বিচার চলল, তারপর অবশেষে সমাপ্তি। অনেকে বলেন ভক্তিমার্গের অনুভবসর্বস্ব প্রভাব হয়ত বা নব্যন্যায়ের মৃত্যুর কারণ, তা কিন্তু ঠিক নয়। একই মানুষ তো একই সঙ্গে সাহিত্য এবং তর্কশাস্ত্রের অনুরাগী হতে পারে, সাহিত্য যার জগৎ অনুভূতি নিয়ে, লজিক যার বিশ্ব তর্কবিচার নিয়ে। আমার মনে হয় নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ক্রমে জনপ্রবাহের থেকেও দূরে সরে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : এক ধরনের intellectual solipsism-এ পরিণত হয়ে গজদন্তমিনারে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল ?

উত্তর : হ্যাঁ, পাশ্চাত্যের symbolic logic এবং **analytic** philosophy সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। subtlety-র নির্জন তুঙ্গে পৌঁছে এর প্রবক্তাও আজ অন্যভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। তৃতীয় কারণ—দেশজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক সামাজিক অস্থিরতা। এহেন অশান্ত সময়ে স্বভাবতই দৃষ্টি অন্যদিকে চলে যায়। পূর্বে সুস্থির পরিবেশে পণ্ডিতসমাজকে মান্য করা হত, টালমাটাল সময়ে তাঁরা তাঁদের আধিপত্য হারালেন, কেউ আর তাঁদের অনুসরণ করতে চাইল না।

প্রশ্ন : কোন সময় থেকে এই ভাঙন শুরু হয় ?

উত্তর : শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এবং তারপর অন্য ধরনের turmoil. উপনিবেশবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার ইত্যাদি।

প্রশ্ন : উপনিবেশবাদ কি এই অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছিল ?

উত্তর : অবশ্যই। যদিও বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন, যেমন উইলিয়াম জোনস্, পরে সংস্কৃতচর্চা করেছিলেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, they did it in their own way এবং এই সত্যটি আমরা বুঝেও বুঝতে চাই না। কোন সাহেব যদি সংস্কৃতের প্রশংসা করে তাহলেই সংস্কৃত পাঠযোগ্য হয়ে উঠবে, এই ধারণা তৎকালীন শিক্ষিত মহলের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল। এবং সেই সুযোগেই ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদরা আমাদের কিছুটা মগজ ধোলাইও করতে পেরেছিল। দেখুন ব্যাপারটা এরকম—British Orientalist-রা, কিছুটা জার্মান আদর্শবাদের প্রভাবে, আমাদের অতীতের সম্মুখীন হয় এবং তা আবিষ্কার করার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তাদের romantic-spiritual ideal ভারতের দর্শনেই উপস্থিত। তারা তাদের জয়গান আরম্ভ করে দেয় এবং দেখাদেখি আমাদের spirituality-র অন্বেষণও বৃদ্ধি পায়। পরিণতিস্বরূপ ঐতিহ্যের অন্যান্য অনেক কিছুকে অবজ্ঞা করে এই আত্মিক আদর্শবাদকে এতদিন magnify বা বিবর্ধিত করে পরিবেশন করা হয়েছে। বলা হয়েছে পশ্চিম-ভোগবাদীবস্তুপ্রিয়, আমরা—অধ্যাত্মবাদী, ত্যাগী—অবান্তর কথা যত—এবং এই অতিসরল বিভেদের উৎস কিন্তু সেই **orientalism** বা প্রাচ্যবাদ। ওরা আমাদের যা শিখিয়েছিল তা নিয়েই আমরা গৌরবে ফুলে ফেঁপে থেকেছি। অবশ্য পরাধীন জাতিকে আত্মায় বিভোর করে রাখলে শাসকবর্গের সুবিধা তো হয়ই। তবু একটা ভিন্ন দ্যোতনা মনে রাখতে হবে। জাতীয় সত্তার বিকাশের জন্য পরাধীনতার পর্বে এই ধরনের আত্মিক চেতনার কিছুটা প্রয়োজন ছিল। মানতেই হবে যে সে সময়ে আমরা আমাদের পরিচিতি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে আমরা সর্বদাই হীনমন্য বোধ করতাম। এই অপমানকে কাটিয়ে উঠবার জন্যই আমাদের একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল যা আমাদের সম্মান ও আত্মগৌরব ফিরিয়ে দেবে এবং আমরা তা পেয়েছিলাম আমাদের আত্মিকতায়। সে পর্বে এই বোধ তার দায়িত্ব সম্পাদন করেছে, বর্তমানে তাকে আঁকড়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই।

প্রশ্ন : কিন্তু অন্যদিকে দেখুন এই ঐতিহ্যের **অবলুপ্তির** সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীতকে কেন্দ্র করেই অন্য এক রীতিসর্বস্ব অন্ধতা আমাদের গ্রাস করেছে। এই মূঢ়তার প্রকাশ দু ধরনের—(১) তুলনায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তথাকথিত হিন্দু অধ্যাত্মবাদের জয়গানে মুখর এবং তার গণ্ডীর বাইরে তারা তাকাবে না। গার্গীর মত তাদের শির খসে যাবার ভয় নেই কারণ তাদের গ্রহণ শর্তহীন, প্রশ্নহীন। (২) এরা তবুও সহনীয়, কিন্তু যারা অসহনীয় তারা এক বিপর্যস্ত সমাজে বসে অবাচীন ritual-এ আশ্রয় খুঁজছে। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন কলকাতার পথেঘাটে শনিপূজার হিড়িক, এভাবে চললে মনসা-বাসুকী কেউই আর বাকী থাকবে না, আমরা রঙীন টেলিভিসন হাতে করে মনসামঙ্গলের যুগে ফিরে যাব। এই ধর্মমতির পিছনে আপনি যাকে বলেছেন ধর্মের অপরিহার্য পূর্বশর্ত "core of morality" তার কোন স্থানই নেই। এই সমূহ অবক্ষয় কি করে রোধ করা **সম্ভব** ?

আমাদের দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে তাকেই উর্বর করে তুলবার জন্য যেমন মাটির সঙ্গে যোগ প্রয়োজনীয়, তেমনই আবার বাইরের দিকের জানালাটাও খুলে দেওয়া জরুরী। ভারতে পাশ্চাত্য দর্শনের অধ্যয়ন শুরু আনুমানিক এক শো বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা এই দর্শনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছি কি ? না। এখানে সেখানে কতিপয় কিছু মন্তব্য চোখে পড়ে—এর বেশী কিছু না। যোগ্য শিক্ষক ছিল, তাঁরা বোঝাতেও পেরেছেন, কিন্তু ক্রিয়েটিভ কাজ বিশেষ কিছু হয়নি।

উত্তর : Post-enlightenment যুগে সমগ্র বিশ্বে ধর্ম সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যার অন্তঃসার হল পূর্বে যে চোখে ধর্মকে দেখা হত বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়। পুরনো প্রক্রিয়ায় ধর্মের পুনরুজ্জীবনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করে সজাগ থাকতে হবে কারণ আমাদের দেশে ধর্ম সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনা প্রচলিত ধর্ম আর শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত অর্থে ধর্ম কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক নয়—pun-এর কি প্রয়োজন—ধর্ম হল নৈতিকতাকেন্দ্রিক এবং এই নৈতিকতাকেই মানবতা-কেন্দ্রিক হতে হবে। অর্থাৎ যে ধর্মে ও নৈতিকতায় মানুষের মূল্য নেই সেই ধর্ম ও আপাতনৈতিকতা পরিত্যাজ্য। সোজাসুজি বললে, রীতি ও গোঁড়ামি মুক্ত ethics এবং moral core-এর আলোচনায় denominational বা organised **religion** -কে টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। তিনি 'Religion of Man'-এ কোন বিশেষ ধর্মের গুণগান করেননি, 'surplus of man' শব্দ কটি ব্যবহার করেছিলেন। জানেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা urge থাকে, বস্তুতান্ত্রিক জগতের চহিদা পূরণের পরও যে আকুতি অটুট থেকে যায়। এখন এই অন্তর্নিহিত আকুতির প্রেক্ষিতেই আজকের ধর্মভাব এমনকি শনিপূজার বিচার করা উচিত। এর ব্যাপ্তি দেখে আমিও যে ব্যথিত হইনি তা নয়, থেকে থেকে **skeptical** attitude-ও গ্রহণ করেছি, নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি যে এর পিছনে পূজারীর সুপরিকল্পিত অর্থস্পৃহা ছাড়া আর কিছুই নেই। তবু এই যুক্তির আলোকে এ অভ্যাসকে পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে না।

অন্য দিকটা বিচার করুন। আমাদের এই চরম স্বার্থসিদ্ধির জগতেও নীতিবোধ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। তরুণ-তরুণীরা শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে, প্রকৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধরত, একজন পপস্টার গাইছে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্য। কেন, এসব তো এঁরা না করলেও পারেন ? এ ধরনের অনেক উদাহরণই প্রমাণ করে যে এই বস্তু-অধ্যুষিত স্বার্থোন্মাদ জগতেও ethics মরে শুকিয়ে যায়নি, হৃদয় শুকিয়ে যায়নি। কল্যাণবোধ ও নীতির এই অবশিষ্টকেই রবীন্দ্রনাথ 'surplus of man' বলেছেন। অতঃপর প্রশ্ন হল,**এই** হৃদয়নিঃসৃত আকুলতার অবলম্বন কি হবে ? Enlightenment পরবর্তী যুগে এই জিজ্ঞাসা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু মন্দির থেকে বিগ্রহ সরিয়ে দেবার পর তার স্থানে আমরা এখনও কিছু বসাতে পারিনি। পরিণামে বিরাট, প্রায় অসহনীয় এক vacuum বা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের পরিবেশেই মানুষ আঁকড়ে ধরতে চাইছে একটা খুঁটিকে, কেউ প্রচার করছেন জোর গলায় Hindu spiritualism আবার কেউ স্বস্তি খুঁজছেন শনিপূজায়, ইতুপূজায়। দলে দলে মানুষ ছুটে চলেছে কুম্ভমেলায়, গঙ্গাসাগরে, পুড়ে পিষ্ট হয়ে মারা যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও। সুতরাং they are looking for something এবং যতদিন না আমরা সার্থক বিকল্প দিতে পারছি ততদিন সেই 'surplus of man'-এর দাবী মেটানোর জন্য পুণ্যের নামে অনাচার চলবে। এর আরো **sinister** revelation আছে। ভেবে দেখুন

বিশ্বের সবচেয়ে রক্ষণশীল, রাজনৈতিক নেতা জনমত কেনার জন্য অবলীলাক্রমে নীতিধারীর মুখোশ পরে, he takes a moral posture । এবং এই বহুবিজ্ঞাপিত নীতিশূন্য যুগে যখনই সে ওই নৈতিক ভঙ্গী গ্রহণ করে তখনই সে বাহবা পায় । রাজনীতিবিদেরা যা ইচ্ছা তাই করছে কিন্তু posture-টি ছাড়ছে না । কেন ? কারণ তারা বিলক্ষণ জানে যে এই সমূহ vacuum-এর যুগে এই posture নিতান্তই লাভজনক, বিশেষ করে সংখ্যাধিক্যের কাছে যারা ভঙ্গীর পশ্চাতে উপস্থিত অভিসন্ধির খবর রাখে না । রাজনীতির ক্ষেত্রে যে Moral posture বিজয়ী, শনিপূজার ক্ষেত্রেও পূজারী বা সংগঠক সেই একই posture দেখিয়ে সফল । এক সার্বিক শূন্যতাবোধের কাছে এরা আবেদন রাখতে পেরেছে ।

প্রশ্ন : কিন্তু এই বিপজ্জনক পরিবেশেই তো আপনি যাকে বলেছেন ethical engagement এবং revival of ethical issues অপরিহার্য, মানুষের সেই উদ্বৃত্তকে একমাত্র কর্মময় ন্যায়বোধই সক্রিয় রাখতে সক্ষম, তাই না ?

উত্তর : দেবতা গেছে যাক, কিন্তু তার জায়গায় একটা value system-কে বসাতেই হবে । প্রয়োজন হলে আবিষ্কার করতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে, কিছু একটা করতেই হবে । এ প্রসঙ্গেই আমার কাণ্টের 'Metaphysic of Moral'-এর কথা মনে আসে । এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে, জানি না উপযোগী কিছু বেরিয়ে আসবে কিনা । আবার বলছি ওই মানবতাকে কেন্দ্রে রেখে একটা কিছু বার করতেই হবে ।

প্রশ্ন : দর্শনচিন্তার revival-এর প্রশ্নে ফিরে আসছি । এখানেই হয়ত পাশ্চাত্য দর্শনের ভূমিকা অনিবার্য । আমাদের যে প্রবাহ অচল হয়ে গিয়েছে কিন্তু যার তলদেশে এখনও অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে, তাকেই আবার স্বতশ্চল করে তুলতে পারে পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে সংযোগ, তুলনা, এমনকি সংঘাত । আপনি কিন্তু বরাবর এই চলিষ্ণু ঐতিহ্যটিকে challenging counterpoint হিসেবে ব্যবহার করেছেন । পাশ্চাত্যদর্শনের এই ফলপ্রসূ ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলুন ।

উত্তর : আমি প্রথমে ভারতীয় দর্শন নিয়েই পড়াশুনা শুরু করি, কিছুদূর এগিয়ে যে কিঞ্চিৎ solipsism-এর প্রভাবে পড়েছিলাম তাও ঠিক । নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম 'এই চর্চার কি কোন সময়োচিত practical relevance আছে ? ভারততত্ত্বের স্কলারশিপ-এ যারা নিয়োজিত তাদের কথা আলাদা, কিন্তু অন্যদের কাছে এর মূল্য কতটা, সত্যিই কি এই দর্শন সেই great intellectual height-এ পৌঁছুতে পেরেছে ?' প্রশ্নপর্বেই আমি পাশ্চত্যদর্শনের জগতে প্রবেশ করি এবং পরে যখন বিশেষ করে আধুনিক analytical philosophy-র সঙ্গে পরিচিত হই এবং দুটি ধারাকে পাশাপাশি বসাতে শুরু করি তখনই বুঝতে পারি যে আমাদের ঐতিহ্যকে যদি সেভাবে উপস্থাপিত করা যায় তার মূল্য স্বীকৃত হবে ।

আমাদের দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে যে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে তাকেই আবার উর্বর করে তুলবার জন্য যেমন মাটির সঙ্গে যোগ প্রয়োজনীয় তেমনই আবার বাইরের দিকের জানালাটাও খুলে দেওয়া জরুরী । ভারতে পাশ্চাত্যদর্শনের অধ্যয়ন শুরু হয়েছে আনুমানিক এক শো বছর আগে, এই দীর্ঘসময়ে আমরা এই দর্শনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছি কি ? না । এখানে সেখানে কতিপয় কিছু মন্তব্য চোখে পড়ে, এর বেশী কিছু না । যোগ্য শিক্ষক ছিল তাঁরা বোঝাতেও পেরেছেন কিন্তু creative কাজ বিশেষ কিছু হয়নি । সমগ্র চর্চাই commentary, sub-commentary-র স্তরে সীমিত থেকেছে । এর পিছনে কারণ হল পাশ্চাত্যদর্শনের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ নেই, অন্যদিকে আমাদের প্রবাহ নিশ্চল । এই পরিস্থিতিতেই দর্শনচিন্তাকে পুনরুজ্জীবিত করার একমাত্র পথ হল নিজেদের দর্শনের সঠিক মূল্যায়ন করে, পাশ্চাত্যদর্শনকে counterpoint হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া ।

আমি বরাবর চেষ্টা করেছি পাশ্চাত্যদর্শন পড়ে যে প্রশ্নগুলি আমার মনে জেগেছে সেগুলি আমাদের পণ্ডিতদের কাছে রাখতে, তাদের ভাষ্যে বা terminology-তে । এদের উত্তর কিন্তু পূর্ণ প্রতিধ্বনি হয়নি, হওয়া সম্ভবও না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ হয়েছে । প্রতিক্রিয়ার এই সাদৃশ্য বা ভিন্নতা দুই-ই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এর অনুধাবন থেকেই creative philosophy develop করে । অন্যদিকে আমাদের ঐতিহ্য উচ্চারিত গূঢ় প্রশ্নগুলিও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে, ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে তাদের বিযুক্ত করে । আমার শেষ বই 'Perceptions'-এ আমি এ ধরনের সংলাপ রচনারই চেষ্টা করেছি । সৌভাগ্যের বিষয়, সংখ্যায় কম হলেও অন্যেরাও অনুরূপ প্রচেষ্টায় ব্রতী ।

মানুষ পুরোপুরি যুক্তিপ্রবণও নয় আবার পুরোপুরি অনুভূতিময়ও নয় । আমরা যদি যুক্তিবিদ্যার বাইরে তাকাতে ব্যর্থ হই, তাহলে অনুভূতির একটা বিরাট বিশ্ব আমাদের কাছে অপরিচিত রয়ে যাবে । ছবি দেখে মুগ্ধ হই কেন, গান শুনি কেন, প্রকৃতি বিহ্বল করে কেন ? কারণ অনুভূতি সৌন্দর্যের জগৎ সত্য এবং আনন্দদায়ক । আসলে দুটি মিলিয়েই মানুষ, দুটির মধ্যে বিরোধিতাও আছে । ভারতীয় দর্শনে এই দুইয়ের ভিতরেই যোগসূত্র রচনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যতটা প্রত্যক্ষভাবে ততটা সম্ভবত অন্য দর্শনে করা হয়নি ।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের দর্শনের সঙ্গে সংলাপ অটুট রাখার প্রয়াসই প্রমাণ করে যে আপনি আমাদের দর্শনকে দুদিক থেকে নতুনভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াসী । (এক) ভারতীয় দর্শনকে তার ভারততত্ত্বের কারাগারে আর আবদ্ধ রাখলে চলবে না যার লক্ষ্য ছিল প্রধানত আত্মিকতার উপর জোর দেওয়া এবং (দুই) একের সঙ্গেই যা যুক্ত, কেন এই ঐতিহ্যের অন্য ধারাগুলিকে মূল্য দেব না—যুক্তিবিদ্যাকে, বিজ্ঞানসাধনাকে, ব্যাকরণকে, ভাষাতত্ত্বকে এমনকি প্রশ্নাকীর্ণ সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যকে । ভারতীয় spirtualism -এর সরল সুধায় তৃপ্ত পশ্চিমকে আপনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন বৈদিক ঋষির সেই নির্ভীক প্রশ্ন, "কোন প্রকৃত দেবতা আছে কি আদৌ, যাকে বন্দনা করতেই হবে ?"

উত্তর : আমি আপনার সঙ্গে একমত । উত্তরে সংলাপের কয়েকটি ক্ষেত্র নির্বাচন করা যাক ।

ভাষাতত্ত্ব : পাণিনি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই তার মূল্য স্বীকার করেছেন । । শুধু ধ্রূপদী যে সংস্কৃত নয়, বৈদিক সংস্কৃতকে একসঙ্গে নিয়ে তিনি যে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন তা যে-কোন বিচারে এক বিস্ময়কর কীর্তি । কিন্তু পাণিনিকে বুঝতে হলে আমাদের সংস্কৃত পড়তে হবে । আক্ষেপের বিষয় ভারতেরই একাধিক বিশেষজ্ঞ চমস্কির তত্ত্ব অনুসরণ করে ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখতে সচেষ্ট, তাঁদের একবারও মনে হয়নি যে এক্ষেত্রে উৎস-ভাষার মডেল অনুসরণ করে সুফল পাবার সম্ভাবনা বেশী ।

নন্দনতত্ত্ব : শুধু ধ্বনিতত্ত্ব নয়, সমগ্র কাশ্মীর ঐতিহ্যের রচনা, যা বুঝতে হলে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন, এর অন্তর্নিহিত মূল্য অনস্বীকার্য । এদের বিশ্লেষণে ও তত্ত্বনির্মাণে যে গাম্ভীর্য ও সূক্ষ্মতা বর্তমান তা এখনকার সাহিত্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বইয়ের সঙ্গে তুলনীয় । প্রসঙ্গত,

নন্দনতত্ত্ব কিন্তু ভাষাতত্ত্বেরই ধারা, আমি বলি অলঙ্কারশাস্ত্র নির্গত হয়েছে পাণিনি থেকে।

যুক্তিবিদ্যা : বিশেষ করে বৌদ্ধদের লজিক। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে বৌদ্ধরা তো নির্বাণের অক্লান্ত সন্ধানী, সেক্ষেত্রে ওরা এত চুলচেরা বিচার করে কেন ? বিচার করেছে এবং নির্মমভাবে, কারণ ওদের চিন্তার প্রগতি সংশয় আর নাস্তিকতার অন্তঃস্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত। এককথায়, আমাদের ঐতিহ্যে যা বলা হচ্ছে মানুষ তা নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে না। সে নিরন্তর প্রশ্ন করছে, বাদ-প্রতিবাদ চলছে, এমনকি mystic নির্বাণ রাজ্যেও পৌঁছনো হচ্ছে নাস্তিকতার সিঁড়ি বেয়ে। এই যে সব কিছু দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখবার প্রয়াস, এই ভয়ঙ্কর সব প্রশ্নের উত্থাপন, আমরা একে ভুলব কি করে ! আমি একাদশ শতাব্দীর একটি বইয়ের কথা বলছি, **'সর্বজ্ঞসিদ্ধি'**, লিখেছিলেন রত্নকীর্তি, যিনি নিজেই বৌদ্ধ। সন্দিহান লেখক প্রশ্ন করেছিলেন, "একদিকে বুদ্ধের ভাব ও অভিজ্ঞতা এবং অন্যদিকে কামপীড়িতের দয়িতার স্বপ্ন দেখা বা মাদকদ্রব্য সেবনকারীর দুঃস্বপ্নের ভিতর পার্থক্য কি ?" অনুসন্ধান ঠিক কি পর্যায়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছেন।

প্রশ্ন : নব্যন্যায়ের প্রতি আপনার আনুগত্য আপনি গোপন রাখেননি ; দর্শনের যে ধারা যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অন্যদিকে চৈতন্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আপনি লিখেছেন পণ্ডিতেরা অবশেষে কূটতর্কের বেড়াজালে আটকে পড়ে চৈতন্যের প্রগাঢ় মিস্টিক ভক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। কেউ কেউ আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্ববিরোধী মনে করতে পারে যদিও যুক্তিবিদ্যা আর মিস্টিসিজম-এর সম্পর্কের উপর আপনার চিন্তা আপনি অক্সফোর্ডে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে (The Logical Illumination of Indian **Mysticism**.) ব্যক্ত করেছেন। তা সত্ত্বেও জানতে ইচ্ছা করে কিভাবে আপনি এই দুটি আপাতভিন্ন দার্শনিক অবস্থানকে মেলাতে প্রয়াসী—একদিকে **reason** ও **skepticism** অন্যদিকে **mysticism** : religion.

উত্তর : মানুষ পুরোপুরি যুক্তিপ্রবণও নয় আবার পুরোপুরি অনুভূতিময়ও নয়। আমরা যদি যুক্তিবিদ্যার বাইরে তাকাতে ব্যর্থ হই তাহলে অনুভূতির একটা বিরাট বিশ্ব আমাদের কাছে অপরিচিত রয়ে যাবে। ছবি দেখে মুগ্ধ হই কেন, গান শুনি কেন, প্রকৃতি বিহ্বল করে কেন ? কারণ অনুভূতি সৌন্দর্যের জগৎ সত্য এবং আনন্দদায়ক। আসলে দুটি মিলিয়েই মানুষ, দুটির মধ্যে বিরোধিতাও আছে। ভারতীয় দর্শনে এই দুইয়ের ভিতরই যোগসূত্র রচনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যতটা প্রত্যক্ষভাবে ততটা সম্ভবত অন্য দর্শনে করা হয়নি। পাশ্চাত্যের নাস্তিকতার আলোচনা পড়ে মনে হয়েছে যে ওরা মূলত সংশয়ের মধ্যেই সীমিত থাকতে চায়, ওদের বক্তব্য হল "সংশয়বাদী রয়ে গেলাম, ataraxia-র পরশ পেলাম, তাই অশান্তি রইল না।"

যখনই ধ্রুপদী চর্চার পক্ষে কেউ কথা বলেন তখনই তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে সম্বোধন করা হয়, অভিযোগ ওঠে যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা স্বচ্ছ চিন্তা করতে আগ্রহী তাঁরা কখনই সেভাবে পিছন ফিরে যেতে চাইবেন না। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে এই অভিযোগ উত্থাপনের পিছনে কারণও রয়েছে, আমাদের দেশে যা বহুবার ঘটেছে তা হল প্রাচীন ভারতের মহিমাগান করতে গিয়ে অধিকাংশ গীতিকারই বড্ড বেশি স্পিরিচুয়ালিটির ওপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের দেশের ঐতিহ্য কিছুটা ভিন্ন এবং এখানে মিস্টিকও দু ধরনের। প্রথম গোষ্ঠী দাবী করে যে মিস্টিক অনুভূতিতে যুক্তির কোন স্থান নেই, তাকে টেনে আনলেই ভক্তির বিভোর শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে ; দ্বিতীয় গোষ্ঠী কিন্তু আরো সাহসী, তাঁরা যুক্তিতর্কের প্রবল অনুরাগী এবং চুলচেরা বিচারের পথ ধরে তাঁরা ওই একই মিস্টিক মার্গে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। এই নয় যে তাঁরা সবাই পৌঁছেছিলেন বা সেটাই অবধারিত পরিণতি, তবে অনেকেই মনে করতেন যে তর্ক করতে করতে যখন শূন্যতায় উপনীত হব তখনই একটা রূপান্তর ঘটবে। আর একটি উদ্দেশ্য তার্কিকদের প্রণোদিত করেছিল, তাঁরা বুঝেছিলেন যে শুধুমাত্র আত্মানুভূতির বর্ণনা সংযোগের মাধ্যম হতে পারে না কারণ তার প্রকৃতি একান্ত ব্যক্তিগত। তাঁরা যুক্তির বোধগম্য পথ অনুসরণ করেছিলেন যাতে অন্যান্যরা এর সাহায্যে চরম অনুভূতির স্বরূপ নির্ণয় করতে পারে।

একজন মিস্টিককে আমি **optimist passionist** বলব। সে জগতকে পাল্টাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে পাল্টায়। পক্ষান্তরে একজন বিপ্লবী activist এবং optimist। সে মিস্টিকের মত বিশ্বকে নিয়ে অখুশী কিন্তু সে তাকে পাল্টাতে চায়। অরবিন্দ প্রথম পর্বে **a+o** ছিলেন পরে হয়েছিলেন **p+o**.

প্রশ্ন : আপনি যখন শূন্যতার কথা বললেন এবং তা থেকে সম্ভাব্য রূপান্তর—তখনই আমার রাসেলের কথা মনে হয়েছিল। প্রখর এই বিবেকী যুক্তিবাদীর আত্মজীবনীর সেই অংশটি স্মরণ করুন যেখানে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের অপার বিস্ময়ে অভিভূত এবং তারপরেই

উক্তি, এই অসীম রহস্যের মাঝে ব্যক্তিমূল্য কতখানি। শুধু যে তিনি তাঁর বিস্ময়কে ভাষা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি লিখেছিলেন "I attribute **inestimable** value to mystic emotion—reveals a possibility of human nature, a possibility of nobler, happier, **freer** life." রাসেল কি আপনাকে প্রভাবিত করেছে ?

উত্তর : বার্ট্রান্ড রাসেলের ভিতর এই তীব্র অনুভূতির স্রোত সর্বদা সচল ছিল। উনি বরাবর out and out skeptic এবং rationalist ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর 'Freeman's worship' 'Mysticism and Logic'-এ অন্য একটি দ্যোতনা থেকে থেকে প্রকাশ পায়। রাসেল বুঝতেন জানতেন যে a purely rational being is an abstraction। তাঁর জীবনের গতি লক্ষ্য করুন—চঞ্চল, মুখর, কর্মময়, একাধিকবার বিবাহ, রাজনীতিতে প্রবেশ, সুতীব্র বিবেকের স্পন্দন। He wanted to participate fully এবং মিস্টিসিজমও একধরনের অনুভূতিময় **participation**। রবীন্দ্রনাথ যে উদ্বৃত্তের কথা বলেছেন তাই হয়ত কয়েকজনের ক্ষেত্রে মিস্টিক অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। আমি skeptic ছিলাম, আছি, তার মানে এই নয় যে অন্যের এ ধরনের অনুভূতিকে আমি তাচ্ছিল্য করব।

প্রশ্ন : এটা সুখবর যে সম্প্রতি আপনি বাংলায় লেখা শুরু করেছেন এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে যা মনে হয়েছে, আপনি আমাদের পুরাণ, পুরাণের প্রসিদ্ধ চরিত্রাবলী, এমনকি গীতার পুনর্মূল্যায়নে হাত দিয়েছেন। এই সময়োচিত পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : জানেন, ইতিহাস শুধু রাজনীতির ইতিহাস নয়, সামাজিক ইতিহাস নয়। মানুষের মনের ইতিহাসেরও মূল্য রয়েছে, মানসিকতার বিবর্তনের ধারাটিও পরীক্ষা করা উচিত। অতীতের মানুষ কি ভাবতো, কিভাবে চিন্তা করত, এসব তো আর তারা লিখে যায়নি ! এই বিরাট, বিচিত্র পরিবর্তনশীল মনটাকে তাহলে আমরা কোথায় খুঁজে পাব—অবশ্যই পুরাণে, মহাকাব্যে। এগুলিকে বিশ্লেষণ করেই মনের ছবিটা সংগ্রহ করতে হবে, বুঝতে হবে কি মূল্যবোধকে তারা সম্মান দিত, কেন, কি পরিস্থিতিতে। নীতিধর্ম কিরকম ছিল **hierarchical** না শাশ্বত, ঐতিহ্য কিভাবে ঐতিহ্যকে সমালোচনা করেছে —এই সব গূঢ় প্রশ্নের উত্তর পুরাণের পরম্পরায় লুকিয়ে আছে।

'রামায়ণ'-এর কথাই ধরুন। পরের রামায়ণগুলি আগের রামায়ণের সমালোচনা, যে নবীন অংশটি লিখেছে সে লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কারণ প্রাচীন অংশের বিধান সে মেনে নিতে পারেনি। কালিদাস মহাভারতের শকুন্তলা কাহিনীকে সমর্থন জানাননি এবং ভবভূতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু এরা তো কেউ সংশয়বাদী ছিল না, ভবভূতি ছিলেন বিরাট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সেক্ষেত্রে কেন তাদের মনে হয়েছিল যে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও রূপ তাদের সময়ের জন্য উপযুক্ত নয়। বৌদ্ধ ও জৈনরাও মহাভারতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের রচনায় সেগুলি অপ্রচলিত রূপ গ্রহণ করে, কেন ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার সময় কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না, বুঝতে হবে কে কিভাবে পুরাণকে ব্যবহার করেছে এবং কেন। এই জিজ্ঞাসাই প্রধান এবং এর উত্তর থেকেই পুরাণের হাত ধরে আমরা বিবর্তনশীল পরিবর্তনময় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্ববীক্ষা সম্পর্কে সঠিক জানতে সক্ষম হব।

ইতিহাস শুধু রাজনীতির ইতিহাস নয়, সামাজিক ইতিহাস নয়। মানুষের মনের ইতিহাসেরও মূল্য রয়েছে, মানসিকতার বিবর্তনের ধারাটিও পরীক্ষা করা উচিত। অতীতের মানুষ কি ভাবতো, কিভাবে চিন্তা করতো, এসব তো তারা লিখে যায়নি। এই বিরাট, বিচিত্র পরিবর্তনশীল মনটাকে তাহলে আমরা কোথায় খুঁজে পাব—অবশ্যই পুরাণে, মহাকাব্যে। এগুলিকে বিশ্লেষণ করেই মনের ছবিটা সংগ্রহ করতে হবে, বুঝতে হবে কি মূল্যবোধকে তারা সম্মান দিত, কেন, কি পরিস্থিতিতে।

আমি কিন্তু বিশ্লেষণের সময় কোন আধুনিক তত্ত্বের সাহায্য **নেব না**— structiralism, Marxism বা existentialism। I want the Puranas to speak for **themselves** তবে হ্যাঁ, একটা পূর্ব শর্ত পালন করতে হবে, বিশ্লেষণ হওয়া উচিত rational discourse বা যুক্তবাদী আলোচনার ভিত্তিতে। পুরাণগুলির প্রকৃতি অক্ষত রেখেই আমি তাদের যুক্তিনির্ভর পুনর্গঠনের কাজে হাত দেব। তার মানে এই নয় যে সেখানে উচ্চারিত মূল্যবোধকে আমি সমর্থন করব।

এ প্রসঙ্গে গীতার কথা মনে আসছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে অনুগীতার অংশটি স্মরণ করুন। অর্জুন কৃষ্ণকে বলছে, "আর একবার গীতা শোনাও, মন প্রশান্ত হবে।" কৃষ্ণের উত্তর, "তখন অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছিলাম, সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি তো সম্ভব নয়।" তার মানে কি, গীতার একটা নির্দিষ্ট সময়গুণ আছে। আসলে আমার কাছে গীতা একটা puzzling বা বিভ্রান্তিকর গ্রন্থ। প্রায় সবাই এর মধ্যে যুদ্ধের যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, আমি কিন্তু মনে করি এর আনাচে কানাচে প্রচ্ছন্ন শৈলীতে যুদ্ধবিরোধী আদর্শ লুকিয়ে আছে। এ দাবী করলেই ঐতিহ্যবাদীরা হইহই করে উঠবে, বলবে "সেকি, ধর্মযুদ্ধের অবমাননা !" কিন্তু বিশ্লেষণেরও তো ভিন্নতা থাকতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি একবার বলেছিলেন, একমাত্র একজন বিগত দার্শনিকের সঙ্গে আপনি সংলাপে প্রবৃত্ত হতে চান, যদি সে সুযোগ আসে। তিনি ইমানুয়েল কান্ট, এই নির্বাচন কেন ?

উত্তর : কান্ট আদর্শবাদী দার্শনিক বলে নয়। কান্ট যে Moral **dilemma** বা নৈতিক সমস্যাগুলি উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি আমাকে ভাবায়। ধর্মনিরপেক্ষভাবে একমাত্র নীতির ভিত্তিতে কান্টই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য দর্শনে এই সমস্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করেছিলেন। অনেকস্থানেই আমি ওঁর dilemmaগুলি ঠিক অনুধাবন করতে পারিনি, তাই সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসা করতাম। শুধু আমি কান্টকে স্তম্ভস্বরূপ মনে করি না, আজকের নৈতিক দর্শনের আলোচনার উপর তাঁর সুবিস্তৃত প্রভাব লক্ষণীয়।

প্রশ্ন : আপনি কিন্তু সত্যিই বড় দুরূহ ভূমিকা বেছে নিয়েছেন। একদিকে চেষ্টা করছেন এখানকার অচলায়তনকে নাড়া দিতে—কান্ট, রাসেল, কোয়াইন, উইতগেনস্টাইন্ প্রমুখের সাহায্যে আবার ওখানকার পূর্ববদ্ধ ধারণাগুলিকে ভাঙবার চেষ্টা করছেন ভতৃহরি, নাগার্জুন, উদয়নের সহায়তায়। আপনার নিঃসঙ্গ লাগে না ?

উত্তর : একসময়ে সত্যি বড় একলা লাগত, এখন ততটা নয়, কারণ কয়েকজন সঙ্গী পেয়েছি। মাঝেমধ্যে যে হতাশবোধ করি না তা নয়, তবে তার ফলে **pessimist** ও **preservist**-এ পরিণত হওয়া কোন কাজের কথা নয়। আমি যে পত্রিকাটি সম্পাদনা করি 'Journal of Indian Philosophy' তারই মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সত্তর দশকের শুরুতে যখন এই পত্রিকাটির ভার গ্রহণ করি তখন ভয় ছিল যে এর দ্রুত মৃত্যু ঘটবে। তা হয়নি, অনেক লেখা আসছে। সংলাপ শুরু হয়েছে এবং আশা রাখি এই সংলাপ অটুট থাকবে।

শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়